'গিরগিটি' গল্পের আলোচনা

'গিরগিটি' জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বহুল আলোচিত এবং পাঠকপ্রিয় একটি গল্প। প্রকৃতি ঘেরা শহরতলির ছোট বাড়িতে মায়া, প্রণব ও ভুবন সকারের বসবাস। স্বামী প্রণব চাকুরে, সাতসকালে দু-বালতি জল মাথায় ঢেলে, খেয়ে অফিসে বেরিয়ে যায় আর ফেরে বিকেল পাঁচটায়। অন্যদিকে উঠান পার হয়ে বাঁ দিকের একটা দেয়াল ঘেঁষে ডুমুর আর পেঁপে জঙ্গলের আড়াল করা নিচু একচালা একটি খুপরিতে ভাড়াটে বুড়ো ভুবন সরকার থাকলেও ওর থাকা না থাকা সমান কথা। সারাদিনের মধ্যে কাশির এক-আধবার শব্দ বা যন্ত্রপাতি চালাবার টুংটাং আওয়াজ কানে আসে– আসে না। দিনরাত বুড়ো ভুবন সরকার কী করে তা দেখবার তিলমাত্র ইচ্ছা বা কৌতূহলও মায়ার নেই। মায়া যেন নিজেতে নিজে মগ্ন। গল্পের শুরুতেই লেখক মায়ার এই আত্মমগ্নতার চিত্র এঁকেছেন এভাবে :

> যদি কেউ এখন মায়ার ঘরে উঁকি দেয় তো দেখতে পাবে দেওয়ালে টাঙানো একটা বড় আরশির সামনে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে ও নিজেকে দেখছে। দেখছে আর যেন আনন্দের আতিশয্যে মৃদু শিস দেওয়ার মতন একটা গানের সুর জিহ্বা ও ঠোঁটের মাথায় জড়িয়ে রেখে তারপর একসময় নিজের নিঃশ্বাসের সঙ্গে বার করে সেটা ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে।[১২]

সৌন্দর্যতৃষ্ণার অসাধারণ গল্প 'গিরগিটি'। এই গল্পের নায়িকা মায়া আত্মসুখী, তার চেয়ে বেশি আত্মমুগ্ধ (নার্সিসিস্ট)। নিজ ভুবনে একা থাকতে থাকতে ক্লান্ত মানুষ আত্ম-দর্শনে সুখ খুঁজে পাবে, প্রকৃতির নির্জনতায় নিজেকে মুক্ত করে দিয়ে নিজেকে আবিষ্কার করবে, আত্মতৃপ্তি পাবে বেচেঁ থাকার, এটাই অনেক সময় স্বাভাবিক পথ – যা গল্পের মূল চরিত্র মায়ার ক্ষেত্রে ঘটেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার প্রতিবেশি বুড়ো ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ভুবন সরকারের স্তুতি। তার কচি পেয়ারার মতো ছোট্ট সুগোল মসৃণ থুতনি, চোখ, নাক, গাল স্বামীর খুব প্রিয়। দু-বছরের দাম্পত্যজীবনে স্বামীর মুখে রাতদিন তার রূপযৌবনের অঢেল লাবণ্যের গতানুগতিক প্রশংসা শুনে শুনে মায়া ক্লান্ত–বিরক্ত। গতানুগতিক একঘেয়ে দাম্পত্যে ক্লান্ত নারী-পুরুষের বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য। তাই দাম্পত্যের পৌনঃপুনিকতায় ক্লান্ত মায়া নিজেই অবলোকন করে শরীরী বৈভবের প্রতিটি ভাঁজ– কখনো আয়নায়, কখনো কুয়োর জলে। নিজের দেহসৌন্দর্যে নিজেই রোমাঞ্চিত হয়। কুয়োতলায় নগ্নস্নানে সে বিমোহিত। প্রকৃতিকে উৎসর্গ করে সেই স্নানদৃশ্য। জলের আয়নায় নিজেকে নতুন করে খুঁজে পায়। কুয়োর জলে নিজের সৌন্দর্য দর্শনে যখন মগ্ন

ঠিক সেই সময় পেছনে কার যেন শব্দ শোনা যায়। প্রচণ্ড চমকে মায়া কোনোরকমে বুকে আঁচল চাপা দেয়। দেখে, হাঁড়ি হাতে করে প্রতিবেশি বুড়ো ভুবন অদূরে পেয়ারা চারাটার গুঁড়ি ঘেঁষে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। শীর্ণ দেহ, ফ্যাকাশে চোখের এই বুড়োকে মায়ার মনেই হয় না লোকটা একজন মানুষ, একজন পুরুষ। মায়ার চোখে– ক্ষীণ হাত-পা, নিষ্প্রাণ চাউনি, মন্থর গতির এই মানুষটি যেন ডুমুর তলার ওধারের পুরানো ভাঙা পাঁচিল বা পাশের মৃত নিষ্প্রাণ হাজারক্ষত চিহ্নযুক্ত মাদারগাছ ভিন্ন আর কিছু নয়। কিন্তু তিন বউ হারানো বুড়ো ভুবনের জরাজীর্ণ বুকে এখনো জেগে আছে তীব্র সৌন্দর্যতৃষ্ণা। এই পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সমালোচকের বিশ্লেষণ :

> 'গিরগিটি' গল্পে বুড়োটা ভাড়াটে বাড়ির বৌটির স্নানের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ। কুয়োর ঠাণ্ডা জলে নিরাবরণ হয়ে ঐ যুবতী বৌটি স্নান করছে। বুড়োর দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপারটা একটি পরিপূর্ণ প্রকৃতি-সংলগ্ন ছবি– নিরাবরণ যুবতীর একাকিত্ব ও তার রূপ, নির্জন কুয়োতলায় পরিপূর্ণতা পেয়েছে– তার গায়ের মসৃণ চামড়ার উপর শুভ্র সাবানের ফেনার সৌন্দর্য দেখে বুড়োটা মুগ্ধ। এই মুগ্ধতার অন্তরালে যৌনবাসনা ক্রিয়াশীল নয়, সৌন্দর্যদৃষ্টি ক্রিয়াশীল। আর ঐ যুবতী বৌটিও দেখে কুয়োতলার নির্জনতা, শ্যাওলা, রোদ, কচুগাছ, জলের ধারা, একটা প্রজাপতি, একটা গিরগিটি। সবটা মিলিয়ে পরিপূর্ণ ছবি।[১৩]

বৃদ্ধ ভুবনের ফ্যাকাশে হলদে চোখ দিয়ে দেখা মায়ার ভেজা নগ্ন শরীর তার রক্তে ঢেউ তোলে। ভুবন তার সৌন্দর্যরসিক চোখ দুটোকে কিছুতেই অস্বচ্ছ হতে দেয়নি। মায়াকে সে যতবার দেখে ততবারই মুগ্ধ হয়। তার শরীরী বিভঙ্গের সঙ্গে কিসের তুলনা করবে প্রতিনিয়ত তা ভেবেই ভুবন সরকার অস্থির। অন্যদিকে সৌন্দর্যপিপাসী মায়ার চোখে বিশ্বপ্রকৃতি যেমন সুন্দর, সে নিজেকেও সেই সৌন্দর্যের সঙ্গে একাকার করে দিতে চায়। স্বামীর গতানুগতিক সৌন্দর্যস্তুতিতে সে সন্তুষ্ট হয় না, স্বামীর লুব্ধ দৃষ্টির সামনে নিজেকে অনাবৃত করতেও কুণ্ঠাবোধ করে। মায়া বুঝতে পারে যে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো ইন্দ্রিয় শক্তি প্রণবের মধ্যে নেই। প্রাণবন্ত নিসর্গ-প্রকৃতির পটভূমিতে ভুবন সরকারকে দাঁড় করিয়ে গল্পকার মায়াকে, তার দৈহিক সৌন্দর্যকে, আয়নায় তার প্রকৃতি দর্শনকে দেখিয়েছেন– যেন জৈব প্রকৃতিকেই উপস্থাপন করেছেন লেখক। মায়ার দৈহিক সৌন্দর্য বর্ণনায় প্রকৃতি থেকে উপমা সংগ্রহ করে করে গল্পকার যেন জৈবপ্রকৃতি ও নিসর্গপ্রকৃতিকে একাকার করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপভোগ করার শক্তি প্রণবের নেই। পাখির কিচিরমিচির, পাখির ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকানোর শব্দ, শিশিরের বা পাতার শব্দ শোনার মতো শ্রবণেন্দ্রিয়ের পারঙ্গমতা প্রণবের মধ্যে অনুপস্থিত। কিন্তু প্রকৃতির সবুজ সমারোহে বৃদ্ধ ভুবনের প্রাণবন্ত উপস্থিতি নিসর্গ-প্রকৃতির রূপময়তার প্রতীক মায়াকে আবিষ্কারের পাশাপাশি স্পর্শও করে ফেলে। ভুবন নিজের জৈব প্রকৃতিকে মায়ার সামনে একসময় তুলে ধরে এভাবে :

> বুড়ো হয়ে গায়ের বল গেছে বটে, কিন্তু ভেতরে রসের বাল্‌ব জ্বেলে রেখে দৃষ্টিটাকে আয়নার মতো ঝকঝকে করে রেখেছি, ছানি পড়তে দিইনি, দিদির কি এখনো বুঝতে বাকি।[১৪]

তিন বউ হারানো বৃদ্ধ ভুবনের জরাজীর্ণ বুকে, ফ্যাকাশে চোখে এখনো জেগে আছে তীব্র সৌন্দর্যপিপাসা। জরাগ্রস্ত কিন্তু সৌন্দর্যপিপাসু চোখটাকে সে কিছুতেই অস্বচ্ছ হতে দেয়নি। মায়াকে সে যতই দেখে ততই মুগ্ধ হয়। মায়ার শরীর বিভঙ্গের সঙ্গে কিসের তুলনা করবে তা ভেবেই বৃদ্ধ ভুবন সরকার অস্থির। কখনো মায়াকে 'ডালিম চারা', কখনো তার চোখের মায়াকে 'রাজহংসীর গতিভঙ্গি', জংলা ছিটের ছায়াকে 'চিতাবাঘিনী' ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করে। আবার কখনো 'দোপাটি ফুলের মালায়' সাজিয়ে নিসর্গ প্রকৃতির রূপময়তার প্রতীক মায়াকে শুধু আবিষ্কারই করেনি, জয়ও করে নিয়েছে। তাই বৃদ্ধ ভুবনের ফ্যাকাশে চোখই হয়ে ওঠে মায়ার আয়না। রাত্রিবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে সেই আয়নায় মায়া নিজেকে আবিষ্কার করে প্রকৃতির মধ্যে। জরাহীন উষ্ণ কোমল হাতটা মরা শুকনো কাঠের গায়ে তুলে দেয় অবলীলায়। পরম বিশ্বাসে সেই আয়নায় নিজেকে মেলে ধরে।

ভুবনের সঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথনে উঠে এসেছে মায়ার সুপ্ত কামনার স্রোতধারা যা ভুবনের ভগ্ন শরীর কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অতৃপ্ত কামনা বাসনার পাশাপাশি, এও বুঝতে পারে যে ভুবনের মধ্যেই রয়েছে সেই সৌন্দর্যকে দেখার জৈব বাসনা। শরীর দিয়ে নয়, চোখ দিয়েই সেই সৌন্দর্য প্রতিমাকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছে বৃদ্ধ ভুবন। সেই সুন্দরের আয়নায় নিসর্গ আর জৈব অস্তিত্ব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। নিসর্গ আর নারীকে একাকার করে সৃষ্টি করেছে প্রতিমার অবয়ব।

জ্যোতিরিন্দ্র ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বনির্ভর কাহিনিগুলিতে মানব-মানবীর সংগুপ্ত যৌবনবাসনার চিত্রায়ণ করেছেন। লেখক বিশ্বাস করেন, মানব মনের অন্য প্রবৃত্তিগুলির মতো যৌন প্রবৃত্তিও এক স্বাভাবিক ক্রিয়া। কিন্তু সচেতন শিক্ষার অভাবে, নৈতিক মূল্যবোধের অভাবে অসংযত চিত্তের বিকার যখন দেখা দেয়, যৌনতা তখনই বিকৃতিতে পর্যবসিত হয়। এ ধরনের মনোবিকৃতির একাধিক কাহিনি রচনা করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র। কিন্তু কখনোই শৃঙ্গাররসের অনর্থক বর্ণনা বিস্তারে মুখর হননি।[১৫] জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক-বিন্যাস নানামাত্রিক তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তিনি আজীবন যেন প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধে নিমজ্জিত থেকে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুমাত্রিক সম্পর্ককে অবলোকন করেছেন এবং প্রকৃতি কীভাবে মানবজীবনকে প্রভাবিত করে সেই চিত্রের পাশাপাশি প্রকৃতিকে অনেক সময় একটি শক্তিশালী চরিত্র হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতিতে বাদ দিয়ে তিনি নারীর রূপ, মানুষের অন্তর্লোকের উন্মোচন করতে পারেন না।

এই গল্পে মায়া যখন প্রকৃতিকে উৎসর্গ করে নিজের স্নানদৃশ্য, তখন প্রকৃতি বাস্তবিকই দ্রষ্টা। এ-রকম প্রকৃতিসান্নিধ্য বিশুদ্ধ ইঙ্গিত আনন্দানুভূতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের ইঙ্গিত বিভূতিভূষণের গল্পেও দেখা যায়। তবে জ্যোতিরিন্দ্রের প্রকৃতি যেভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলে সে-রকম সম্পর্ক বিভূতিভূষণের গল্পে দেখা যায় না।